Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 118–126
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

'দয়াময়ীর কথা' : দেশভাগ পরবর্তী সময়ের এক অনন্য দলিল

রামকিশোর বর্মণ
গবেষক
বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সহকারী অধ্যাপক
শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়
ই-মেইল: ramsam1981@gmail.com

Keyword
দয়াময়ীর কথা, সুনন্দা শিকদার, দেশভাগ, মাজম শেখ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশভাগের অন্যতম দলিল

Abstract
সুনন্দা সিকদারের 'দয়াময়ীর কথা' একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। গ্রন্থটি ২০১০ সালে আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে সুনন্দা শিকদার 'দয়াময়ীর কথা' রচনা করেন। 'দয়াময়ীর কথা' সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য দলিল। সুনন্দা শিকদারের বাল্যকালের নাম দয়াময়ী। তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত বর্তমান বাংলাদেশের অবিভক্ত ময়মনসিংহ জেলার দিঘাপইত নামে এক অখ্যাত গ্রামে। সুনন্দা শিকদার বাল্যকালে মাজম নামে এক মুসলমান ভাগচাষীর তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে উঠার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বিধবা পিসিমার স্নেহলতার কাছেই থাকতেন তিনি। মাজম শেখ তাঁর কাছে ছিলেন সহোদর দাদার মত। মাজম শেখকে তিনি দাদা বলে ডাকতেন। এই দাদার স্মৃতিচারণা থেকেই 'দয়াময়ীর কথা' গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। শিশু সুনন্দার সঙ্গে দাদা মাজম শেখের এতটা আত্মিক যোগ ছিল যার স্মরণে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে ময়সিংহের দিঘাপইত এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে বসবাসকারী মানুষগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, হিন্দু ধর্মের পেশা ভিত্তিক জাতিভেদ প্রথা, দৈনন্দিন জীবনে লালিত বিভিন্ন সংস্কার-কুসংস্কার, লোকংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক সাবললীলভাবে লেখিকা প্রকাশ করেছেন।

Discussion
সুনন্দা সিকদারের 'দয়াময়ীর কথা' ২০০৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন লেখিকার বয়স ৫৭ বছর। বইটি 'গাঙচিল' থেকে প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ চিত্র অঙ্কন করেন বিবেকানন্দ সাঁতরা। পেঙ্গুইন বুকের প্রকাশনায় অচিন্ত্য ঘটক এর ইংরেজি অনুবাদ করেন *'A Life Long Ago'* নামে। গ্রন্থ প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থটিকে লীলা মজুমদারের স্মৃতিতে 'লীলা পুরস্কার'-এ সম্মানিত করা হয়। ২০১০ সালে 'দয়াময়ীর কথা' আনন্দ

পুরস্কারে ভূষিত হয়। ২০১৯ সালে কিশোর সেনগুপ্ত এর নাট্যরূপ দেন। বইটি আত্মজীবনী নয়, জীবনের কতগুলি খণ্ড চিত্র মাত্র।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ ভারত উপমহাদেশের এক চিরন্তন ক্ষত। প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করে ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মের নামে হিন্দু প্রধান ভারত এবং মুসলমান প্রধান পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দেশভাগের এই মর্মান্তিক ঘটনার খেসারত দিতে হয়েছে উভয় সম্প্রদায়কেই। পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচত ছিল। যদিও পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে ধর্ম নয়, ভাষা এবং সংস্কৃতির জন্য মূলত পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন হয়ে বাংলাদেশ নামে আত্ম প্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে সুনন্দা শিকদার 'দয়াময়ীর কথা' রচনা করেন। ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। মুসলিম লিগ এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বের অনৈক্য এবং অবিশ্বাসের বাতাবরন শুরু হয়েছিল বিংশ শতকের গোড়ার দিকেই। মৌলবাদী শক্তির দাপটে দাঙ্গা বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষকে সুদূরপ্রসারী মূল্য দিতে হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাংশে শহরগুলিতে মূলত দাঙ্গার ভয়াবহতা ছিল সবচেয়ে বেশি। যে এলাকাগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো লিখতে পড়তে পারা মানুষের সংখ্যা বেশি সেই এলাকাগুলিতেই ধর্মীয় উস্কানীতে সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা ভয়াবহ। মৌলবাদী দাঙ্গাবাজরা হিন্দুদের সম্পত্তি লুট, নারী এবং শিশুদের উপর বর্বর অত্যাচার এবং হত্যালীলায় মেতে উঠেছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য মান-সম্ভ্রম এবং আত্মরক্ষার তাগিদে দলে দলে সাত পুরুষের ভিটেমাটি ফেলে রেখে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছিল অনির্দিষ্টের পথে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুগ যুগ ধরে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট ছিল। অসাম্প্রদায়িক মানুষের সংখ্যাই বেশি। যুগ যুগ ধরে দাঙ্গা বাঁধায় একধরণের সুবিধাবাদী সুযোগ সন্ধানী বর্বর মানুষের দল। এদের সংখ্যা কম অথচ শক্তিশালী। তৎসত্ত্বেও ভালো মানুষগুলির আশ্বাস, বিশ্বাস এবং অকপট ভালোবাসায় জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ ভিটে-মাটির টানে পূর্বপাকিস্তানেই থেকে গিয়েছিল। উত্তরের জেলাগুলিতে তুলনামূলকভাবে শান্তি ছিল। প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে দাঙ্গার বিষবাষ্প প্রবেশ করেনি তখনও। 'দয়াময়ীর কথা'য় সেই নিরীহ, সত্যবাদী, নির্ভেজাল মানবতাবাদী মানুষের কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

> *"দেশবিভাগ শুধু দুইবাংলাকে খণ্ডিত করে গিয়েছে তা নয়, শত শত ধারণা, সহস্র সংসার, লক্ষ লক্ষ মানুষকে সর্বার্থে ছিন্নমূল করেছে। সেই ক্ষত থেকে আজ আর রক্ত পড়ে না বটে, কিন্তু সেই বেদনা আজও অশ্রুপাত ঘটায়, তার থেকেই জন্ম হয় 'দয়াময়ীর কথা'র মতো অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তির।"* [১]

'দয়াময়ীর কথা' সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য দলিল। সুনন্দা শিকদারের বাল্যকালের নাম দয়াময়ী। তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত বর্তমান বাংলাদেশের অবিভক্ত ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমান জামালপুর জেলা) জামালপুর শহর থেকে উনিশ কিলোমিটার দূরে দিঘাপইত নামে এক অখ্যাত গ্রামে। গরীব মানুষগুলোর মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক হলাহলের বিষদন্ত গজিয়ে উঠেনা লেখিকা তাঁর বাল্য স্মৃতিকথায় সেই ধ্রুব সত্য কথাগুলি তুলে ধরেছেন। লেখিকার ময়মনসিংহের দিঘাপইত গ্রামে এ ধরণের সাম্প্রদায়িক হানাহানির কোনো খবরই ছিলনা। দেশভাগের পরও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়নি। লেখিকা তাঁর শৈশব স্মৃতিতে বলেছেন-

> *"আমার শৈশব স্মৃতি যা একান্তই আমার, যা চিরকাল অনুচ্চারিত রেখে দেব। এরকমই ভাবনা ছিল। কিন্তু একসময় স্মৃতি ভার দুঃসহ হয়ে ওঠাতে লেখা ছাড়া আর উপায় রইলনা।"* [২]

দশ আমার বছর বয়স পর্যন্ত (১৯৫১-১৯৬১) লেখিকা তাঁর শৈশব জীবনের স্মৃতি কথা তুলে ধরেন। গ্রন্থটিকে আত্মজীবনী বলা চলেনা। আত্মকথা বলা যেতে পারে । আনা ফ্রাঙ্কের *'A Diary of young Girl'* এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। অথবা মহাত্মা গান্ধীর '*My early Life'* এবং বিদ্যাসাগরের 'বিদ্যাসাগর চরিত' গ্রন্থের মত টুকরো টুকরো ছবির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জীবন কথা।

সুনন্দা শিকদার বাল্যকালে এক মুসলমান ভাগচাষীর তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে উঠেছিলেন। বিধবা পিসিমার কাছেই থাকতেন তিনি। শিশু দয়া (সুনন্দা) রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের মেয়ে হয়েও গৃহের ভৃত্য এবং ভাগচাষী মাজম তাঁকে দেখাশোনা করত। তাঁকে ছোটবেলায় দিঘাপইতের মাটির গন্ধ চিনিয়েছিলেন। মাজম শেখ তাঁর কাছে ছিলেন সহোদর দাদার মত। মাজম শেখকে তিনি দাদা বলে ডাকতেন। এই দাদার স্মৃতিচারণা থেকেই 'দয়াময়ীর কথা' গ্রন্থের

আত্মপ্রকাশ। শিশু সুনন্দার সঙ্গে দাদা মাজম শেখের এতটা আত্মিক যোগ ছিল যার স্মরণে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করতে বাধ্য হন।

> *"এক মুসলমান ভাগচাষীর তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে উঠছিল একটি হিন্দু পরিবারের শিশু। শিশুটির মনে প্রশ্ন এসেছিল– কী চায় তার দাদা রোজ আল্লাহ্‌র কাছে। দাদার কাছে জানতে পারে, পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য চাইতে হয় অন্নবৃষ্টির আশীর্বাদ। জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, গাছপালা সকলের শুভ। এমনি করেই দিনে দিনে সেই ধর্মপ্রাণ মানুষটি ছোট মেয়েটির মধ্যে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন, মানুষ আর প্রকৃতির সম্পর্কে। স্নেহ-ভালোবাসা, অনেক সম্পর্কের টানাপোড়েনে ঋদ্ধ সেই শৈশব আর শৈশবের প্রিয়জনদের হারানোর বেদনা আজও বহন করে চলেছেন লেখিকা।"*[৩]

লেখিকা সুনন্দা শিকদার তাঁর রচনা শুরু করেছেন 'দাদার কথা'র মধ্য দিয়ে। দাদা মাজম শেখের মৃত্যু সংবাদ যখন তাঁর সঙ্গে পৌঁছয় তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। দীর্ঘ দিন্ ধরে তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। দেশভাগের পর সুনন্দার বাবা-মা উভয়েই কলকাতা চলে আসেন। দুজনেই ময়মনসিংহে চাকরি করতেন। ছোট্ট সুনন্দাকে তাঁর পিসিমার কাছে রেখে দেন। সেখানে রেখে দেওয়ার অনেক কারণ ছিল। পিসিমা তাঁর পৈতৃক ভিটে স্নেহভরে খড়কুটোর মত আগলে ছিলেন। দেশভাগের তিক্ত যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার করাল স্রোত ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত দিঘাপইত গ্রামে কোনো আঁচ লাগেনি তখনও। দিঘাপইত মুসলমান গ্রাম হলেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট ছিল। অতি সচেতন যারা ছিলেন তারা সাত পুরুষের ভিটে-মাটি ফেলে ভারতে চলে এসেছিলেন। ওই গ্রামেই আসপাশের অনেক হিন্দু পরিবারের শূণ্য ভিটে পড়ে আছে। সুনন্দার বাবা 'বুনো' (ডাক নাম) কোনোদিন দেশত্যাগের কথা ভাবেননি। প্রতিবেশী দত্তদের ভিটে-মাটি ক্রয় করতে কোনো দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু ঘটনাচক্রে সুনন্দার বাবা এবং দাদা কলকাতায় চলে আসেন। সুনন্দার দাদা তখন কলকাতার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তেন। আর পিসিমা পনেরো বছর বয়সেই বিধবা হন। আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত অতিকষ্টে শ্বশুর বাড়িতেই বৈধব্য জীবন কাটে তাঁর। সুনন্দার বাবা এই বিধবা বোনকে নিয়ে আসেন পৈতৃক ভিটে দিঘাপইত গ্রামে। খুব সম্মানের সঙ্গে থাকতেন পিসিমা। গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদাভেদ ছিলনা। বাড়িতে পুজো-উৎসবে সকলেরই অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তবে নিয়মনিষ্ঠ হিন্দু হওয়ার জন্য মুসলমান অতিথি-চাকরবাকরদের জন্য আলাদা করে ব্যবস্থা করা হত। মাজম দাদা ভিন্ন ধর্মের মানুষ। আচার-আচরণে নিষ্ঠাবান ধর্মীয় অভ্যাস থাকলেও শিশু সুনন্দা তথা দয়ার কাছে তাকে ভিন্ন ধর্মের মানুষ মনে হয়নি। এই দাদার যখন মৃত্যু সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন-

> *"বুকের মধ্যে যে বেদনার পাহাড় লুকোনো ছিল, পলকে আমি তার খবর পেলাম। বুঝতে পারলাম সেই জমাট পাহাড় ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। আমি যেন ভেসে যাচ্ছি মাটির উপর থেকে, মাধ্যাকর্ষণের টান যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে।"*[৪]

আজম এবং মাজম দুই ভাই গরীব চাষী। আজম শেখ বর্গাদার। জমিদার তাকে বর্গা থেকে উচ্ছেদ করেছে। আজমের এই করূণ দুর্দশা ছোট্ট দয়ার ভাল লাগেনি। দিঘাপইত সোন্‌টিয়া, হরিদ্রাটা, গৈজাপাড়ার নদীঘাট খুব ছোট বেলা থেকে সবই দেখেছেন, ঘুরেছেন লেখিকা দয়া। দাদা মাজম শেখই সব পরিচয় করে দিয়েছে তাঁকে।

বাড়িতে চাকর-বাকরদের জন্য মোটা হাঁসখোল ধানের ভাত খেতে দেওয়া হত। যেটা দয়ার অপছন্দ ছিল। মাজম দাদারা তাড়াতাড়ি যাতে হজম না হয় এজন্য তারা মোটা ভাত খায়। মোটা ভাতই তাদের বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট। গরীব মানুষের জন্য দামী সরু চালের ভাত নয়। দয়া তাঁর পিসিমাকে মা বলে ডাকতেন। তিনি তাঁর পালিকা মা। দেরিতে হলেও দেশভাগ পরবর্তী সময়ে দিঘাপইত গ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পৌঁছে ছিল। পলুকাকা, কানাই-বলাই যখন দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসে। তখন হরিদ্রাটা থেকে পড়শী সাদিকাকা, সোন্‌টিয়া থেকে ইয়েদালি কাকা এসেছিল। চারিদিকে কান্নার রোল। বিশ্বাস বাড়ির ঠাকুমা, ঘোষবাড়ির খুকি পিসিমা, চোদ্দোগণ্ডার জেঠীমা সারা জীবনের মত স্বভূমি ত্যাগ করে হিন্দুস্থানে পাড়ি দিল। এদের ছেড়ে যাওয়া বাড়িতে বদলি হয়ে হিন্দুস্থান থেকে সমসের কাকা আজগর চাচা বসত করে। এই দৃশ্য শিশু দয়ার মনে নাড়া দিয়েছিল। সমসের কাকা, আজগর চাচাদের সুনন্দার পিসিমার পছন্দ হয়নি। এরা কোচবিহার থেকে এসেছিল। এদের ভাষা সংস্কৃতি এবং পরিধেয় নিয়ে ঘোর আপত্তি ছিল

সুনন্দার পিসিমার। শিশু দয়া বাড়িতেই একটু আধটু লেখা-পড়া শেখে। দয়া ক্রমশ বড় হচ্ছে দেখে দেশ ত্যাগ করে কলকাতায় তার বাবা-মায়ের কাছে রেখে আসার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। দয়ার শিশু মন এসব বুঝতনা। দিঘাপইতের পরিচিত মাটির ঘন্ধ, চারদিকের লোকজন, গাছপালা এবং পশু-পাখির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা হয়ে গেছে। এসব ছাড়া সে অন্য কোনো কিছুই ভাবতে পারেনা।

দয়ার স্মৃতিকথায় বাড়ির টেপি নামের গাভীর প্রসব, কামার পাড়ার মানুষের কথা, গ্রামের অভাবগ্রস্ত মানুষের চুরি করা, চুরি করতে গিয়ে মাথা ফেটে যাওয়া, দে' বাড়ির টগার দেশ ত্যাগের গল্প, দক্ষিণ ভারতের দণ্ডকারণ্যে গিয়ে তাদের বাস করা, পাড়ার নদীতে নতুন সেতু নির্মাণের সময় শিশু পুতে দেওয়া এইসব গুজবের ভয়ে আছরদা দয়ার কান ফুটো করে দেওয়ার মত কুসংস্কার, সহায় সম্বলহীন আইলাকেশীর মৃত্যু, পিরবাবার কথা, রাতকান্দুচোরের চুরি, মোদিভাবীর কথা, দেশ ভাগের যন্ত্রণায় দগ্ধ মদিনা বিবির হা-হুতাশ, মেজভাবীর করাচি যাত্রা, গরু-বলদের কথা, প্রচলিত লৌকিক চিকিৎসা, ইয়েদালি কাকার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টধর্মের মহাপুরুষদের সম্পর্কে আলোচনা করা, গ্রামে সাপের কামড় এবং ওঝার কেরামতি, দয়াদের বাড়ির পাট বিক্রির সময় পাইকারদের প্রসঙ্গ, হিন্দু জমিদারদের দাপট, বিধবা বিবাহ সবশেষে দয়ার দেশ ত্যাগ এবং ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থন, প্রসঙ্গ সবই সুনন্দা শিকদারের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সুনন্দা শিকদারের জন্ম ১৯৫১ সালের ময়মনসিংহ শহরে তাঁর বাবার ডিপার্টমেন্টের কোয়ারর্টারে। বাবা-মা দেশ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে এলে তিনি পিসিমার কাছে থেকে যান। নিঃসন্তান বিধবা পালক মা পিসিমার সঙ্গে থাকতেন দিঘাপইত গ্রামে। ১৯৬১ সালে দেশ ত্যাগ করে পালক মা সহ সুনন্দা ভারতের কলকাতায় তাঁর বাবা-মায়ের কাছে চলে আসেন। প্রগাঢ় স্নেহ দিয়ে গর্ভধারিনী মায়ের মত লালন-পালন করেছিলেন। পিসিমার নাম স্নেহলতা। একমাস বয়সে শেয়ালের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। বিয়ের পর পনেরও বছর বয়সেই তিনি বিধবা হন। স্বামী মারা যাওয়ার পর আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি নানা দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে শ্বশুর বাড়িতে থেকে যান। দয়ার বাবা বুনো দিঘাপইত গ্রামে নিয়ে আসে। এখানেই তিনি ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ভাইঝি দয়া ওরফে সুনন্দা শিকদারকে কাছে রেখে নিজের মেয়ের মত লালন-পালন করেন। জীবনের শূন্যতাকে ভরাট করে রেখেছিল এই ছোট্ট ভাইঝি। কেবল বহুযুগ আগে দেখা বলিষ্ঠ স্বামী যিনি এই পৃথিবীর মায়া মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। অগোচরে তার ছায়া শসনে নিষ্ঠাভরে জীবন-যাপন করেছিলেন তিনি। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত তিনি তখনও যতটুকু জায়গায় জমি ছিল সেগুলি চাষবাস এবং উদ্যান পালন করে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট ভারত বিভাজনের পর ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলমান প্রধান পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তানে। যখন দেশভাগ হয় তখন লেখিকার জন্ম হয়নি। দেশভাগের তিন বছর পর তাঁর জন্ম হয়। দেশভাগের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে চলে এলেও সেখানে হিন্দুদের একটি বড় অংশ থেকে যায়। দাঙ্গার রেশ সেখানে অব্যাহত ছিল। সমকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিনিয়ত আশঙ্কার জন্য সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে। এই আশঙ্কা অমূলক ছিলনা। পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে ভিটে-মাটি ছেড়ে হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসতে থাকে।তবুও অনেকেই সেই দেশে থেকে গিয়েছিল। জাতি-ধর্মের বিভেদ ভুলে নির্দ্বিধায় একসঙ্গে বসবাস করছিল। ঘটনাচক্রে দয়া ওরফে লেখিকা সুনন্দার বাবা অন্নদা (বুনো) এবং মা অন্নদা ভারতের কলকাতায় চাকরি পেলে তাঁরা ভারতে চলে আসে। যেকারণেই হোক দয়াকে নিঃসঙ্গ সন্তানহীন বিধবা কাকাতো বোন স্নেহলতার কাছে রেখে চলে আসে। তিনি নিরুদ্রব দিঘাপইত গ্রামেই থেকে গেলেন। দিঘাপইত গ্রামে হিন্দু-মুসলমসান মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছিলনা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মিলেমিশে বসবাস করছিল। পিসিমা স্নেহলতার বাড়ির ভৃত্য ছিল একজন মুসলমান। নাম মাজম। সেও ছেলের মত চাষবাসে সহযোগিতা করছিল। দয়া যাকে নিজের দাদার মত ভালো বাসত এবং মাজমও ক্ষুদে দয়াকে নিজের বোনের মত স্নেহ করত। ষাটোর্ধ স্নেহলতা আট মাসের দয়াকে আদর যত্ন করে তার জীবনের শূণ্যতা দুর করলেন।

দয়ার জীবনে যা কিছু প্রাপ্তি সবটাই তাঁর পালক মা পিসি স্নেহলতা। শৈশবের দশ বছর জীবনে যা তিনি পেয়েছিলেন সারা জীবন তিনি হৃদয়ভরে আঁকড়ে ধরেছিলেন। পিসিমা স্নেহলতা নামের এখানেই সার্থকতা অর্জন

করেছে। জীবনে পিসিমা অনেক লড়াই করেছিলেন- নিয়তির পরিহাসের ব্যর্থ হয়েছেন। তবুও জীবনে কোনো তাঁর খেদ ছিলনা। দয়া তথা সুনন্দা শিকদারের শৈশবকালে ভুলো পিসিমার প্রভাব অপরিসীম। এই ভুলো পিসিমা হলেন পিসিমা স্নেহলতার ননদ। তিনি দশ বছর বয়সেই বিধবা হন। তিনি বাড়িতেই বহু কষ্ট স্বীকার করে একটু-আধটু লিখতে পড়তে শিখেছিলেন। দয়াকে তিনি খুবই আদর যত্ন করতেন। তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত দয়াকে আকৃষ্ট করত। তাঁর কাছ থেকে এইরকম মুক্ত অন্তঃকরণ একতা মন পেয়েছিলেন। সেটা ছিল দয়ার কাছে পরম বিস্ময়। ভুলোপিসি জীবনে কোনো কিছু করপ্তে না পেলেও তাঁর এতটুকু দৈন্যতা ছিলনা। আশ্রমে আশ্রমে আর স্টেশনে স্টেশনে জীবন কাটানো এই হতভাগা নারী দয়াকে খুব প্রভাবিত করেছিল।

দয়ার জীবনে আদ্যোপান্ত এলাকা জুড়ে ছিল মাজম দাদা। এই মাজম দাদাই দয়ার শৈশবের সব কিছু। মাজম দাদার জন্য তিনি হয়ত এই গ্রন্থটির অবতারনা করেছেন। সুদীর্ঘকাল থেকে বয়ে আসা জাতিভেদ প্রথা নিমেষেই হারিয়ে যায়না। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদভাব বর্তমান ছিল। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মচারণে ভিন্ন মার্গ। উভয় সম্প্রাদায়ের মধ্যে আর্থিক দিক দিয়ে সাম্য ছিলনা। তবুও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। মাজম দাদার অপত্য স্নেহে কাঁধে চড়ে বাড়ির পার্শ্ববর্তী বংশী নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়া দয়ার শিশুমনে এক অনন্য অনুভূতি। দণ্ডকলসের ঝাড়, নানারকম ঘাসফুল, চুলের মুঠি ধরে ঝুলে ঝুলে শরীর দর্শন। বুকের চুলে, গায়ে কোথায় কোথায় জড়ুল এগুলো দয়ার শিশুমনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। ১৯৬১ সালে দয়া পিসিমার সঙ্গে বাবা-মায়ের কাছে ভারতে চলে আসে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছিল। পরম উৎকণ্ঠায় কেটেছিল শৈশবে ফেলে আসা স্মৃতিকণা, পরিচিত প্রতিবেশীদের কথা। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন হলে। কিছুদিনের মধ্যে মাজম দাদার মৃত্যুর খবর। সুনন্দা শিকদারকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। এই দাদার কাছ থেকেই দয়া জেনেছিল আল্লাহর সঙ্গে দুর্গা-লক্ষ্মীর কোনো ঝগড়া নেই। বেহস্তে সকলের মধ্যেই ভালোবাসা থাকে।

মাজম শেখের ভাই আজম শেখ যিনি দয়ার কাছে আজম দাদানামে পরিচিত। এই আজম দাদার সঙ্গে কালজিরা চাল, হাঁসখোলের ভাত সোমটিয়া, হরিদ্রাটা, বংশী নদী এবং দিঘাপইত জুনিয়ার হাই স্কুলের পরিচয় ঘটে। দয়ার প্রতিটি স্মৃতিতে ভেসে উঠে সেই সব ছবি। তিনি কখনও হিন্দু-মুসলমান এবং খ্রিস্টান হতে চাননি। হতে চেয়েছিলেন একজন প্রকৃত মানুষ। জাতি-ধর্ম সবই মানুষের সৃষ্টি। দয়াময়ী একজন অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। প্রতিবেশীদে'রা দেশত্যাগ করলে আজমের বর্গাদারি চলে যায়। দেশত্যাগীদের জমি কিনেছে কাষ্ঠসিঙ্গার শেখরা। সেই জমি তারা নিজেরাই চাষ করে। প্রয়োজনে আজমকে শ্রম দিতে ডাকে। দেশভাগের আগে ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির দাঙ্গা বারবার হিন্দুদের যেন তাড়া করে।

> *"এই দাঙ্গা দয়ার জন্মের আগে হয়েছিল। সেই দাঙ্গায় হিন্দুদের উপর মুসলমানেরা প্রবল অত্যাচার করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে পরে দেশভাগ হয়। হিন্দুরা মুসলমানদের 'অপঘিন্না' করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। এই অপঘিন্নার প্রতিশোধ নিয়েছিল কী মুসলমানেরা? অতীতে হিন্দুরা মুসলমানদের তাদের ঘরে ঢুকতে দিতনা, দাওয়ার বাইরে খাওয়ানো, আলাদা হুকো, আলাদা বাসন এই চর্চা চলেছে অনেকদিন। তারই প্রতিশোধ কী এ দাঙ্গা? এইসব দুরুহ চিন্তাগুলো মাথায় ধারণ করে দয়া বেড়ে উঠেছিল।"* [৫]
>
> *"আমি রাধিয়াদির রান্না অনেক কিছু খেতাম। ওদের চালের খুব অভাব, সেই জন্যে ওরা পেঁয়াজ দিয়ে কচুর লতি চচ্চড়ি করত ঝাল করে...। প্রথম যেদিন ওদের কচুর লতি চচ্চড়ি খাই, সেদিন ওই অপরাধ করে এসেই শ্লেটে সে কথা লিখেছিলাম। শ্লেটে লিখলে পাপটা বোধ হয় কমে যেত, আর লিখতে পেরে খুব আনন্দ হত।"* [৬]

সহজ-সরল অভাবী বুনিয়াদি নির্দ্বিধায় দয়াকে খেতে বলে –

> *"তুমি খাও, দয়া। এখনও তর আট বছর হয় নাই। তর কুন পাপ হবেনা। আর একশো আটবার নারায়ণ লিখবি সেলেটে, সব পাপ ধুয়ে যাবে।"* [৭]

দয়া জাতি-ধর্মের ব্যবধান বোঝেনা। প্রচলিত বিশ্বাসকে মেনে নিয়ে জাত-ধর্মের উর্ধ্বে ওঠার মানসিকতা শিশু বয়সেই তৈরি হলেছিল।

দয়ার বয়স যখন দশ। তখন পিসিমার দেশ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি চলছে। পরিচিত দিঘাপইতের গণ্ডি পেরিয়ে অজানার দেশ হিন্দুস্থানে পাড়ি দেবে। পিসিমা দেশ ত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেননা। কিন্তু দয়ার বাবা-মা পালক মাতার কাছে আর কতদিন রাখবে। দয়ার পিসিমা দেশ ত্যাগের কারণ কী ছিল সেটা প্রায়ই বলত।

> *"মা আমাকে প্রায়ই বলত, দয়া আমি দ্যাশ ছাড়ার কথা ভাবতামনা। এক তোমারে তোমার বাপ মায়ের কাছ থিকা নিয়া আইসা, মানুষ কইরা আমি ঠেকছি, নিজের তোমার সঙ্গে জড়াইচি।"* [৮]

কোচবিহার থেকে বদলি করা রিফিউজিদের পছন্দ করতেন না। প্রথমত তারা অপরিচিত। দ্বিতীয়ত লেংটিপরা জাত, তৃতীয়ত হিন্দুদের ফেলে আসা জমিতে কোচবিহারের মুসলমানেরা ভোগ করছে। স্থানীয় চির পরিচিত গরীব গুলোর কোনো সাধ্য নেই। স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব ছিল। গ্রামে দেশ বিদেশের খবর পৌঁছতো দেরিতে। জামালপুর অথবা ময়মনসিংহ থেকে 'ইত্তেফাক' নামে খবরের কাগজে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জওহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আয়ুব খানের সম্পর্কের ভিত্তি নির্ভর করে। বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতেন। দুই দেশের সম্পর্ক কোনোদিন ভালো ছিলনা। কাজেই পিসিমার পাসপোর্ট-ভিসাহীন দেশ দেখে হলনা। হিন্দু জমিদারদের দাপট ছিল তখনও। কিন্তু তারা অনিষ্ট করতনা। হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের অটুট শ্রদ্ধা ছিল। দিঘাপইত গ্রামে মুসলমানদের রাষ্ট্রের মধ্যে এই ধারণা কোনোদিন কারো মনে আসতনা। দিঘাপইত গ্রামে জাতপাত নিয়ে ব্রাহ্মণদের উর্ধ্বে বলার কেউ ছিলনা। বামুন-কায়েতরা আগের মতই সেখানে জীবন-যাপন করছে। স্কুলের পরীক্ষায় পুরোহিতের ছেলে কানু এবং মৌলবী সাহেবের ছেলে জমিরুদ্দিনকে হারিয়ে দিয়ে ফার্স্ট হয় এজন্যই বোধ হয়।

ইয়েদালি কাকা দয়াকে মহাপুরুষদের সম্পর্কে ঋদ্ধ করেছিল। গ্রাম্য সহজ-সরল মানুষ ইয়েদালি কাকা। তিনি হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রিস্ট ধর্মের মহা পুরুষদের সম্পর্কে অবহিত করেছিল। সকল ধর্মের এক কথা ভেদাভেদ নয়, ভালোবাসাই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইয়েদালি এবং সুবহান সকল ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান চর্চা করত। কোনো ধর্মকে ছোট করে দেখতে নেই। শিশু দয়া ইয়েদালি কাকার কাছ থেকে গৌতমবুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারেন। তবুও ভারত-পাকিস্তানের এইসব জাত-ধর্ম কেন, এসব কঠিন সংকট এবং মনোবিকলনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে রইলেন দয়াময়ী। সোরহান দাদার কাছ থেকে গান্ধিজী সম্পর্কে জানতে পারেন। নায়েবালি দাদা হিন্দুস্থানের বড় নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে জানতে পারেন। নায়েবালি তুলনায় সম্পন্ন কৃষক। তার নিজের গাড়ি (গরুর গাড়ি) এবং বলদ জোড়া ছিল। এই নায়েবালি দাদার গরুর গাড়িতে করে অষ্টমীর মেলায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা দয়ার শিশু মনকে আনন্দ দিয়েছিল। কোচবিহার থেকে বদলি হয়ে আসা ছৈঞা, মোতিয়াল, সমসের কাকা, আছর ভাই, মনিরা চাচি, আজগর কাকাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। সমসের কাকা তুলনায় ছিল সংস্কার মুক্ত, উদারমনা। "অতবড় শরীরে একটুরো ন্যাকড়া পরা অক্ষর পরিচয়হীন সমসের চাচার মতো পরিশীলিত মানিষ আমি কম দেখেছি। আমাদের গাঁয়ের সব বউয়ের মুখ ছি ঘোমটা ঢাকা নতুন বউয়ের মুখ দেখতে হলে, বউয়ের বাড়ির লোক বলত-

> *'চোখ মুঞ্জ গো', বউ চোখ বুঁজলে তবেই ঘোমটা খোলা হত। সারা গাঁইয়ের মধ্যে একমাত্র সমসের চাচার বউয়ের মুখখানিই দেখা যেত। সন্ধ্যায় চাচি হাত-পা ধুয়ে পায়ে খড়ম পড়ত। এইসব স্বাধীনতা গাঁইয়ের অন্য কোনও বউয়ের ছিলনা।"* [৯]

নরেশ কর্মকার বড়কর্তা এবং রমেশ কর্মকার মেজকর্তা এরা কর্মকার পাড়ার বর্ধিষ্ণু কামার। এদের টাকা পয়সা করেছে। এরা ভারত-পাকিস্তানের টাকা-পয়সার কারবারি করে। এরা কখনোই দেশত্যাগের কথা ভাবেনা। সারা বছর লোহা দিয়ে কাস্তে, দা, কুড়ুল, লাঙ্গলের ফলা তৈরি করে এরা। লেখিকা জাতপাতের দ্বন্দ্ব এবং অভাবী গারো সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গও এড়িয়ে যাননি।

> *"দয়াময়ীর কথা' আমাকে নিয়ে গিয়েছে কিছুটা মডার্ন আর্টের বারান্দায়, যেখানে 'কোলাজ' বা খণ্ডচিত্রের সমাহারে একটি সুসংবদ্ধ 'থিম' বা বিষয়েচরিত্র-চিত্র ফুটিয়ে তোলে।র নিঃসংশয় আভাস ফুটে ওঠে, ছোটো ছোটো টুকরোর মধ্যে সামঞ্জস্য বা সাযুজ্য থাকুক বা না থাকুক। অথবা metallic micro-structure এর মতো, যেখানে প্রতিটি grain boundary সুস্পষ্ট এবং প্রতিটি গ্রেইন অন্যটির থেকে আলাদা হয়েও সামগ্রিক একটা পরিষ্কার চরিত্র-চিত্র ফুটিয়ে তোলে।"* [১০]

'দয়াময়ীর কথা'য় গাছপালা, জীবজন্তুদের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ব প্রাকশ পেয়েছে। দাদা মাজম শেখের ঘাড়ে চড়ে যখন বের হয়েছিল ছোট্ট দয়া তখন কাঁঠালের 'নুচি' (এঁচোড়) ছিঁড়ে সাদা আঠাইয় ভরে গিয়েছিল তার শরীরে। সেই মাজম দাদার কাছ থেকে কাছ থেকে জানতে পারে সে গাছেদের কষ্টের কথা। বাড়ির উঠোনে বিভিন্ন রকম ফুলের গাছের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা এভাএই জন্মেছিল তাঁর। গৃহপালিত গরুর আদর করে নাম রাখা হয় বুড়ি, পার্বতী, টেপি, মঙ্গল, শুক্কুর এবং বিস্যুতের মা ইত্যাদি। এইসব নামকরণ গৃহপালিত পশুর প্রতি ভালোভাসার এ এক অপূর্ব নিদর্শন।

> *"আজ আমাদের বাড়িতে একটা খুব আনন্দের ব্যাপার হয়েছে। আমাদের টেপির ডাক আসছে। আমি প্রথম ব্যাপারতা দেখি আমাদের টেপি নামের গোরুর লেজের তলা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দেখতে পাই।"*[১১]

এবং বলদ দুটি সিম্পর্কে তিনি বলেছেন-

> *"বলদ দুটির নাম রেখেছিল কানু ও ভানু। নায়েবালি দাদার বদলে আমি ডানিডানি-বাঁবাঁ বলতে আমার কথা ওরা বুঝতে পারত।"*[১২]

'দয়াময়ী কথা'য় স্থানীয় লোকবিশ্বাস লেখিকার শৈশব মন খুব সহজ-সরল মনে ধারণ করেছিল যেমন- টেপি নামের গোরুর প্রসবকালে তার কপালে পিসিমার সিঁদুর পরানো, সাপ কাটলে ওঝার তুকতাক, ঝিঙ্গের ফুল খাওয়া, অষ্টমীর মেলায় ব্রহ্মপুত্র নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করার সময় গায়ে দুধ-কলা মাখা, সাপের উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা পেতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণ এবং পির বাবার প্রতি বিশ্বাস। সাপের ভয়ে হোমিওপ্যাথির ডাক্তার শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাবণ শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন মনসাপুজোর সময় বলাইকাকাকে সর্পদংশন করলে মুসলমান ওঝার কেরামতি, হিন্দু-মুসলমান উভয়র সম্প্রাদায়ের পদ্মা বা মনসার উপর অটুট বিশ্বাস সবই সুনন্দা সিকদারে কোলাজে ধরা পড়েছে।

স্থানীয় লোকসঙ্গীতের প্রসঙ্গও 'দয়াময়ীর কথা'য় ব্যক্ত হয়েছে। শিশুদের ছড়া, ভাওয়াইয়া গান, পদ্মাপুরাণ বা মনসার গান, লোকছড়া, জারি এবং সারি গান কোনো কিছুই বাদ পড়েনি এই গ্রন্থে। শিশুদের খেলার সময় প্রচলিত লুকোচুড়ির ছড়া-

"ঝিক ঝিক ঝিক ময়েংসিং
ঢাকা যাইতে কতদিন
একমাস তেরোদিন
ফু-উ-উ।"[১৩]

(শিশুরা মনে করে ট্রেনে চেপে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা যেতে একমাস তেরোদিন সময় লাগে।)

খনার বচনের মত অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ছড়া-

"পঞ্চরবির মাসে কয়-
খরায় কিংবা ঝরার বয়।"[১৪]

(যে মাসে পাঁচটা রবিবার হয়, সেই মাসে খরা অথবা ঝড়ের ভয়।)

অগ্রাহায়ণ মাসে যখন ফালানির মা ধান ভেনে চাল পায় । সেই চালে যখন ভাত রান্না করে তখন উনুনের চারপাশে লক্ষ্মণ এবং বোন আকালি আনন্দে নেচে গান গায় এবং বলে,

"ভাতের বাসনা বাতাসে
চান্দ হাসে তারা হাসে
কাউঠ্ঠা যদি পাইতাম
ছালুন বানাইতাম।" [১৫]

দয়াময়ী আছরকাকার কাছে গান শুনতে চাইলে ফকির আছরকাকা গেয়ে উঠে-

"সাধের ইলশারে ...।

ছাওয়াল কান্দুইনা মাছ
হশুর ভুলাইনা মাছ।
আঙ্কুলি পাগল মাছ
ইলশারে..... ।" [১৬]

আছরকাকা ক্ষুধায় ক্লান্ত হলেও দয়াকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শ্লোক শোনাত-

"ধীরভাবে কার্য সিদ্ধ
কার্য সিদ্ধ ভোজনে,
জাগরণে গৃহ সিদ্ধ
নারী সিদ্ধ দমনে।" [১৭]

'দয়াময়ীর কথা' মান্যচলিত ভাষায় রচিত। গ্রাম্য সরল মানুষগুলোর মত বাক্যগুলি ছোট, অর্থদ্যোতক এবং গতিশীল। প্রয়োজনে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার কথ্য ভাষার প্রয়োগ করে গ্রন্থটিকে আরও প্রাঞ্জল এবং সমৃদ্ধ করেছেন লেখিকা। এই অঞ্চলের লোকভাষা মাটির কাছাকাছি নিয়ে গেছেন। যেমন-*"তোমাগো ঘরবাড়ি পুড়ল, দ্যাশ ছাইড়ত্যাছ, কিন্তু জেদটা ঠিক পুইষ্যা রাখছ।"* বঙ্গালি উপভাষার নির্ভুল ব্যবহার করেছেন লেখিকা। তবে কোচবিহারের তোরসা পাড় থেকে বদলি হয়ে আসা সমসের কাকা, আজম চাচা, ছৈঞা, রহিমা বিবিদের কোচবিহারী ভাষা বা রাজবংশী ভাষার প্রয়োগ করতে পারেননি। গ্রন্থ উল্লিখিত তাদের কথিত কোচবিহারী ভাষা এবং ময়মনসিংহের ভাষার মধ্যে পার্থক্য চোখে পড়েনি। উত্তরবঙ্গে এবং ময়মনসিংহ জেলায় যে প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সাদৃশ্য লক্ষণীয়- গিলাপ (চাদর), বাসেনা (সুগন্ধ), জালি (জালা/কচি), পইঠা (স্থিত হওয়া), কাঁকই (চিরুনি) প্রভৃতি। ময়মনসিংহে ব্যবহৃত কতগুলি স্বতন্ত্র শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন– জাঙ্গল (লাইন/সারি), শাটি চাইট্টা (দারিদ্রের লক্ষণ), খুদের জাউ ইত্যাদি।

> *"ভাষার নিরাভরণতা, কাব্যিক উপমা-অলঙ্কারে সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, স্থানে স্থানে নিরাবরণ স্বীকারোক্তি একবারের জন্য হলেও মোহনদাস করমচাঁদের 'My Early Life' কে মনে পড়ায়।"* [১৮]

লেখিকার অকপটময়তা গ্রন্থটি উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'দাদার কথা', 'আজম মাজম দুই ভাই', 'দিঘাপইত গাঁয়ে টালমাটাল দিন' 'লিখতে শেখা পড়তে শেখা', 'যেতে না-চাওয়া, যাওয়ার প্রস্তুতি', একটি সদ্য যুবকের মৃতদেহ', 'স্মরণীয় দিনগুলি', 'গাঁইয়ের আরও কিছু কথা', 'যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি', 'দূরের মানুষ কাছে', 'রহমাবিবির তিন মুষ্টি', 'চান্দ খাঁ ও আছরভাইয়ের কথা', 'মাইগা সুধীরদাদা', 'আইলাকেশীর মায়ের মরণ', 'কাতকান্দুচোর', 'পড়াশুনোর কথা', 'এক পিরবাবার কথা', 'শাস্তর', 'মোদিভাবির কথা', 'আমার মা', 'মেজ ভাবির করাচিযাত্রা', 'বিবাহবৃত্তান্ত', 'ইদ রোজা আর কাজকর্ম', 'গোরু-বলদের কথা', 'জাত আর ধর্ম আর চিকিতসা', 'জমিদারদর্পণ ও দারোগার দফতর', 'সামাজিক বয়কট ও কুৎসা রটনা', 'গ্রামজীবনের আনন্দ', 'শেষ মোচ্ছব', 'হিন্দুস্তান যাওয়া', পুরনো দুঃখের গল্প', 'কামালের কথা', 'পরিত্যক্ত ভিটে', 'অমুদার দরাজ দিল', 'জনৈক হাজি একটি মৃত্যু', 'দুই শ্যামাচন ও ওঝার কেরামতি', 'পাটের কথা ও পাইকর সাহেবের কথা', 'দেশে বাবার শেষবার আসা', 'এক বিধবা বিবাহ', 'যা জানতে চাওয়া যায়না', এবং 'অক্রূর সংবাদ' প্রভৃতি অধ্যায় যেন চলচ্চিত্রের মন্তাজের মত একের পর এক ছবি ভেসে উঠে পাঠকের দৃষ্টিতে।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, শান্তনু, পরবাস, সংখ্যা-৪৮, মে, ২০১১, গ্রন্থ সমালোচনা, দয়াময়ীর কথা- সুনন্দা সিকদার https://www.parabaas.com/PB48/LEKHA/brShantanu48.shtml
২. সিকদার, সুনন্দা: দয়ামীর কথা, গাঙচিল, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৩. ঐ
৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৯
৫. মৌসুমী কাদের, গল্পপাঠ, আলোচনা দয়াময়ীর কথা-সুনন্দা সিকদার, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ https://www.galpopath.com/2015/02/blog-post_66.html
৬. সিকদার, সুনন্দা: দয়ামীর কথা, গাঙচিল, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃষ্ঠা-২৩
৭. ঐ,
৮. ঐ, পৃষ্ঠা-২০
৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৪৮
১০. চক্রবর্তী, শান্তনু, পরবাস, সংখ্যা-৪৮, মে, ২০১১, গ্রন্থ সমালোচনা, দয়াময়ীর কথা- সুনন্দা সিকদার https://www.parabaas.com/PB48/LEKHA/brShantanu48.shtml
১১. সিকদার, সুনন্দা: দয়ামীর কথা, গাঙচিল, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃষ্ঠা-৩৬
১২. ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৬
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৩
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৫
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৭
১৭. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৮
১৮. চক্রবর্তী, শান্তনু, পরবাস, সংখ্যা-৪৮, মে, ২০১১, গ্রন্থ সমালোচনা, দয়াময়ীর কথা- সুনন্দা সিকদার https://www.parabaas.com/PB48/LEKHA/brShantanu48.shtml